বাংলা নাটক ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্বঙ্গে

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দির শেষ দশক পর্যন্ত কলকাতার সরকারি থিয়েটার পাড়ায় জৌলুস ছিল। তারপর থেকে থিয়েটারের চৌম্বক শক্তি ক্রমশ কমতে থাকে। থিয়েটারের খেদ, দর্শক আসছে না, দর্শকের অভিযোগ, থিয়েটার তাদের টানতে পারছে না। থিয়েটারের পাল্টা অভিযোগ, দর্শকরা টিভিখোর হয়ে পড়েছে। টিভি আর টিভির অজস্র চ্যানেলের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারলে গ্রুপ থিয়েটারের বিবেক পরিষ্কার থাকে। থিয়েটারের বয়স, আমরা দেখছি, দুশো বছর পেরিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভিঘাত এই প্রথম এল না। বায়োস্কোপ এসেছে, ছবি হাঁটে চলে। টকি এসেছে, সেছবির মানুষ তখন কথা বলে, গান গায়। সাংঘাতিক চমক । রেডিয়ো এসেছে, গ্রামাফোন এসেছে --- যাকে আমরা বলতাম কলের গান। তখনও থিয়েটার চলছে, কোনও নতুনটাই থিয়েটারকে শেষ করে দিতে পারেনি। হঠাৎ টিভি এসে এমন অসাধ্যসাধন করল কী করে?

বিষয়টা অন্য দিক থেকে দেখা যাক। যা কিছু জনমনোরঞ্জক তাতেই চ্যানেলগুলির আগ্রহ। নাচ - গান - সিনেমা - ক্যুইজ 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' ইত্যাদি। কোনও চ্যানেল বাংলা নাটকের স্লট খোলে না কেন। তারা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখেছে বাংলা নাটকের নিয়মিত টেলিকাস্ট দর্শক টানবে না। কেন? প্রথম কারণ, বেশির ভাগ বাংলা নাটকে (আমরা একাঙ্ক নাটকের কথা বলছি) বিনোদনমূলক কথাবস্তু বা প্রমোদ - উপকরণ নেই। ঝিনচকাচক লঘু প্রমোদের কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রথম যখন নাটক দেখা শু করি,হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে তখন মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মহেন্দ্র গুপ্ত। তাঁর স্বরচিত সংলাপ তাঁর স্বরক্ষেপের উচ্চাবচতায় কবিতারমতো শোনাত। শুধু এই কারণে, আরও হাজারো দর্শক শোতার মতো আমিও তাঁর ফ্যান ছিলাম। আমি তো কোন্ ছার, ফ্যান ছিলেন বাংলা থিয়েটারের এক উজ্জ্বল 'নক্ষত্র' শ্যামল ঘোষও। কেউ যদি বলেন, ওসব গদ্যকবিতার মতো বানিয়ে তোলা ন্যাকা ন্যাকা ডায়লগ আজকাল চলে না মশাই, আমি বলব, তাহলে যেসব মেগা সিরিয়াল দেখে বুঁদ হন সেগুলোর ডায়লগ কী? বানিয়ে তোলা, সাজিয়ে বলা, মহেন্দ্র গুপ্তের ফর্মুলার অপটু অনুকরণ এবং কোনওখানেই সেই কবিতার মতো জাদু নেই। তাতেই যদি থিয়েটারকে কোণঠাসা করতে পারে, নির্মলেন্দু লাহিড়ি মহেন্দ্র গুপ্তের অলৌকিক উচ্চারণের অনুশীলন, তার উপযুক্ত সংলাপ রচনার উদ্যম নাটককে আবেগের এমন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিতে পারে যে চ্যানেলগুলিকে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে থিয়েটারের সামনে --- যেমন একদিন রেডিয়ো জনচির সেবা করেছে কলকাতার পেশাদার মঞ্চ থেকে জনপ্রিয় টাটকা নাটক সরাসরি সম্প্রচার করে।

এই যে কবিতার মতো করে সংলাপ বলা, এর সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের একটা যোগ আছে, এই হল দর্শক বা শ্রোতার প্রথম এন্টারটেনমেন্ট। কানের সুখ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দৃশ্যপটের জাঁক, তখন আবার চোখের আরাম। এখনও যে 'সিরাজদৌল্লা', কি 'সাজাহন' নাটকের রেকর্ড বা টেপ বাজছে শুনলে বাঙালি থমকে দাঁড়ায় সে এই এন্টারটেনমেন্টের জন্যে। জানি নাট্যবস্তুর মান উন্নত না হলে শুধু এ দিয়ে প্রযোজনার দৈন্য ঢাকা পড়ে না। তবু এন্টারটেনমেন্ট একটি অনিবার্য উপাদান, তা সে যে ফর্মেই হোক। দিন দিন এ বস্তু থিয়েটার থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে। হাস্যকৌতুক তো বলতে গেলে ব্রাত্য। অথচ রমাঁ রঁলা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, এন্টারটেনমেন্ট না থাকলে পিপ্লস থিয়েটার হবে না।

এখানে নাটকে বাস্তবতার বহু আলোচিত কেতাবি প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। থিয়েটার জিনিসটা, আমাদের শ্বাস, আগাগোড়া বানানো, অসত্য এবং অবাস্তব। দর্শক সেকথা জেনেই মঞ্চের সামনে আসন গ্রহণ করেন। মঞ্চে নাটকের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য থাকলে তাইদেখে তিনি যে আতঙ্কিত হন না, দৌড়ে পালান না, সে এই কারণে। বাস্তবতার দোহাই তাই একটা ভণ্ডামি, অযোগ্যের অক্ষমতার একটা অজুহাত। নাটকের নিছক রিয়ালিটির কোনও দাম আছে বলে মনে হয় না। নাটক জীবনের দর্পণ --কথাটা শুধু ক্লিশে হয়ে গেছে তাই নয়, কথাটার মধ্যে সারবস্তু ছিল না কোনওদিনই। জীবনে যা ঘটে অবিকল তাই মঞ্চে হাজির করলে দর্শক হাসতে পারে, কাঁদতেপারে, উত্তেজনায় মারমুখী হয়ে উঠতেও পারে। তাতে কী! এর কোনওটাই এমন কিছু না যার জন্যে নাটকের বা আরও ব্যাপকভাবে বললে কোনও শিল্পের দ্বারস্থ হতে হবে। নাটকে সেটা কাজও নয়। প্রতিদিন যা ঘটছে আমাদের জীবনে দেখছি কিংবা অপরের জীবনে ঘটছে বলে শুনছি, প্রত্যক্ষ সেই বহির্বাস্তবের জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে, রেডিয়ো - দূরদর্শন আছে, রাজনৈতিক চাপান - উতোর আছে, খবরের কাগজ আছে। প্রচারমাধ্যমের চাপে বহির্বাবাস্তবের চেহারাটাও সময়বিশেষে এমন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় যে আমরা বুঝতে পারি না কেমন করে আমরা বেঁচে আছি। সেই বিভ্রান্তির সময়, আমি চাই, নাটক আমাদের সেই জীবনকে দেখাক যে জীবন আমরা যাপন করি অথচ যে জীবনকে আমরা চিনি না। কী ভাবে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সংবাদপত্রে প্রতিবেদিত দিনানুদৈনিক বাস্তবের মধ্যে যে বাস্তব আছে,যাকে বলি আন্তর্বাস্তব, তাকে প্রকাশ করে। যেমন পাই রবীন্দ্রনাথে। তখন সেটা নাটক এবং সাহিত্য।

সাধারণভাবে এখনকার নবীন নাট্যকার ও গ্রুপ থিয়েটারের দলপতিরা নাটকে কাব্যকে প্রশ্রয় দেন না। এখন সেই সাবেক ট্র্যাডিশন আবার ফিরে এসেছে। কোনও ঘটনা হৈ হৈ ফেলে দিলে তাই নিয়ে নাটক বানাও। গুজরাত কাণ্ডর পর থেকে সাম্প্রদায়িকতা বাংলা থিয়েটারের নতুন হজুগ। রাজ্য - রাজনীতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বুলি কপচাচ্ছে,তল্পিবাহক গ্রুপ থিয়েটারও অমনি কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে ময়দানে। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাটকের পাণ্ডুলিপির জন্য দলপতিরা হন্যে হয়ে ঘোরে নাট্যকারের দোরে দোরে। কোনওরকমে একটা লাগিয়ে দিতে পারলেই আগমার্ক প্রগতিশীল গ্রুপ বলে চিহ্নিত হতে দেরি হবে না। চিহ্ন দেবে কারা? ক্ষমতার অলিন্দে বসে গোটা পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার নাট্যদলের নড়নচড়নের ওপর যারা সতর্ক নজর রেখে চলেছেন। তাদের হাতে পুরস্কারের প্রসাদ ও তিরস্কারের দণ্ড।

সাম্প্রদায়িকতার রকমফের আছে -- ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা, এবং সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা। অথচ এদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলতে শুধুমাত্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বোঝানোর একটা অপচেষ্টা বহুকাল যাবৎ চলেআসছে। কোথাও একটা ধর্মীয় দাঙ্গা হলেই আমরা গেল গেল রব

তুলি। কিন্তু দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় গোর্খা ও নেপালি ভাষাগত বিরোধ সম্পর্কে আমরা যে খুব সচেতন এমন মনে হয় না। ভাষা ও ধর্ম নিয়ে একটা জগাখিচুড়ি ধারণা আজও বাঙালির মধ্যে আছে। এর কারণ আমাদের জীবনচর্যার সীমাবদ্ধতা ও ভণ্ডামি। মুখে হিন্দু - মুসলমানের মিলিত বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলি, কিন্তু ক ার্যত বিশ্বাস করি হিন্দু সংস্কৃতিতে। বাংলা থিয়েটারে খালেদ চৌধুরী নামটাই এর তীব্র প্রতিবাদ, এবং অদ্যাবধি একমাত্র। বর্তমানে যে গ্রুপ থিয়েটার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী হুজুগে মেতেছে, সাম্প্রদায়িকতা ও নাট্যকর্মীর দায়বদ্ধতা জাতীয় গালভরা বিষয় নিয়ে সেমিনার করছে; তার সংখ্যা কত, জানতে ইচ্ছে করে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা কম নয়। দেশবিভাগের আগে ও পরেও এই রাজ্যে হিন্দু - মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে। 'দা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' তো আজও দুঃস্বপ্ন। স্বাধীনতার পর ৫৮ বছর কেটে গেল, নানা কারণে অজস্র ক্ষয়ক্ষতি সয়েও একটা বিরাট সংখ্যক মুসলমান পশ্চিমবঙ্গেই রয়ে গেছেন। হিন্দু সংস্কৃতিতে বাঙালি সংস্কৃতিতে তাদের অবস্থানটা কোথায়, বাংলা থিয়েটার কি তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছে? তুলসী লাহিড়ির কয়েকটি নাটক বাদ দিলে কটা যথার্থ নাটকে মুসলমান চরিত্র এসেছে? ক'জন নাট্যকার তাদের সামাজিক - সঙ্কটকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন? এ বাবদে বাংলা সাহিত্যের অপরাপর শাখা, কবিতা উপন্যাস, নাটকের চেয়ে মুসলমান জীবনের অনেক কাছাকাছি গেছে। মুসলমান জনজীবন নিয়ে গৌরকিশোর ঘোষ যে তথ্যনিষ্ঠ উপন্যাস লিখেছেন বাঙালি নাট্যকারের কোন নাটক তার সমকক্ষতার দাবি করতে পারে? সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধি অনেক গভীরে, হুজুগে মত্তহয়ে সে গভীরতাকে স্পর্শ করা যায় না। তাই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী নাটক হিসেবে যা লেখা হয় তা নিতান্তই ইচ্ছাপূরণের রূপকথা।

নবনাট্য আন্দোলনের নামে এবং আধুনিক হবার উগ্র অভিলাষে আমরা বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, এমনকী অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথকেও নির্বাসিত করেছি। দেশজ মাটিতে ও জাতীয় চেতনার মধ্যে যাঁদের শিকড় প্রোথিত। সম্প্রতি সুমতি হয়েছে আমাদের। রবীন্দ্রনাথ করছে একাধিক গ্রুপ। সরকারি উদ্যোগে গিরিশচন্দ্র মঞ্চায়িত হয়েছে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নবনির্মাণ ঘটেছে যোগ্য হাতে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'শাজাহান' ও করেছে সমর্থ দল। বলা যায় সুবাতাস বইছে মৃদুমন্দ। মাইকেলের প্রহসনদুটিকে তো আধুনিক প্রযোজনায় অমর করে রেখে গেছেন উৎপল দত্ত।

গ্রাগুক্ত পূর্বসূরির নাটক নিয়ে কাজ ব্যতিক্রমী ঘটনা। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র - দ্বিজেন্দ্রলাল, অভিনীত থাকবেন, অথচ বাংলা নাটকের আলোচনা তাঁদের নিয়েই ঘুরপাক খাবে, এমন উলটপুরাণ খেদের বিষয়। তাঁদের নিয়ে কিছু ভালো, আর বেশিরভাগ দাগা বুলনো লেখা হয়েছে তাতে তাঁরা অপেক্ষা করতে পারবেন নতুন সমর্থ ন াট্যসমালোচকের জন্য। আজ অনুসন্ধান করা জরি একালের নাট্যকারদের মনোভূমি। শুধু মনোজ মোহিত - দেবাশিস - ইন্দ্রাশিসের নয়, মফস্বল বাংলার হরিমাধব মুখোপাধায়, অমল চক্রবর্তী, নীরজ বিশ্বাস, সত্যেন ভদ্র, অমল রায়, বিদ্যেশচন্দ্র লাহিড়ি, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ আরও অনেকের। এঁরা তো নাট্য আকাদেমি রাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নন, তবে কে এই মুখ ফিরিয়ে থাকে?

যেমন - যেমন মনে এল না করলাম, এঁদের বাইরেও অনেক বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্যকর্মী আছেন রাজ্যে বিভিন্ন জেলায়, আছেন বা ছিলেন রাজ্যের বাইরেও। দিল্লীতে সেবাব্রত চৌধুরি, শিশিরকুমার দাশ, তড়িৎ মিত্র, বোকারোয় নবেন্দু সেন, মুম্বাইয়ে দিব্যেন্দু গুহ, অলোক ধর, তুফান মুনশি, লাকি মুখার্জি। এঁদের লেখা প্রকাশিত হলে এঁরা এই ভেবে আনন্দ পাবেন যে বাংলা থিয়েটারের যৌথপরিবারে তাঁদেরও সমান শরিকানা। একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্মীর কর্মক্ষেত্র বিহারের ঘাটশিলা। নাম অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভৌগোলিক কারণে বাংলা নাটকের মূল ভূখণ্ড থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। তাঁর কাজের মূল্যায়ন দূরে থাক, নাট্যবিষয়ক পত্রপত্রিক া ও গ্রন্থাদিতে কতাচিৎ উচ্চারিত তাঁর নাম। এঁর কথা পরে হবে, পশ্চিমবঙ্গে দুটি নাট্যঅঞ্চলের কথা সেরে নেওয়া যাক।

বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার (১৯৮৬) যাঁরা গড়েছেন তাঁরা পোড়- খাওয়া নাট্যকর্মী। ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছিলেনপ্রান্তিক - এ। প্রান্তিক তখন বহরমপুরের বেশ নামকরা দল। বাঙালির থিয়েটারে ভাঙন কিছু নতুন কথা নয়। ট্র্যাডিশন চলে আসছে সেই ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে। প্রদীপ ভট্টাচার্য, তন্ময় স ান্যালেরা প্রান্তিক থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়লেন - বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার। উদ্দেশ্য ভিন্নতর নাট্যচর্চা। সেই ভিন্নতার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁদের প্রথম প্রযোজনার নাটক নির্বাচনে। 'মুক্তধারা' নানাভাবে পরীক্ষিত হয়েও সর্বাংশে মঞ্চ সফল হয়নি। কলকাতার বড় দলও এটিকে ঠিক গুছিয়ে তুলতে পারেনি। একথা অজানা ছিল না বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটারের। তবু নতুন করে ভাবনাচিন্তা করে 'মুক্তধারা'ই প্রযোজনা করলেন তারা। হেলে ধরার চেয়ে কেউটে ধরা অবশ্যই দুঃসাহসের কাজ। রেপার্টরি সে দুঃসাহস দেখিয়েছে এবং কেউটেকে অনেকাংশে জব্দও করেছে। সমৃদ্ধ নাট্যকর্ম হিসাবে রেপার্টরির দুটি প্রযোজনা -- 'তে াতা কাহিনী' (১৯৮৮) ও 'দংশন' (১৯৯০) নাট্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে। পরের পর আর যেসব নাটক তারা প্রযোজনা করেছে --- 'তাসের দেশ', 'সত্রেতিসের সন্ধানে', 'ভোগ', 'আর্তুরো উই', 'আত্মদাহ' -- এই তালিকা থেকেই দলের মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে যায়। নাট্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই যে আপসহীন নীতি কলকাতার অনেক দলেই এখনও তা অনায়ত্ত। রেপার্টরি নাটক করবার সময় প্রচলিত জনচির সেবা করলে সফল হবার চেষ্টা করেনি। বরং স্থানীয় জনচির বদলে যথার্থ ন াটকের রসগ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছে। সঙ্কীর্ণ অর্থে আঞ্চলিকতাকে তারা আমল দেয়নি। মাত্র দশ বছরে বহরমপুরকে বিশেষ নাট্যমনস্ক করে তুলতে কলকাতা ও দিল্লীর বিখ্যাত প্রযোজনা এনে প্রতি বছর রেপার্টরি নাট্যোৎসব করেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার সহযে াগিতায় স্থানীয় নাট্যকর্মীদের জন্য ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের নাট্যশিক্ষা দিয়ে তাদের নাটক করানো, আদিবাসী শিল্পী সমন্বয়ে 'চাঁদ - সদাগর' নাট্য নির্মাণ। আঞ্চলিকতাকে আশ্রয় করে রেপার্টরি কলকাতাকে আকর্ষণ করেছে। তাঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'মায়া' আমন্ত্রিত অভিনয়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বহুরূপীর উৎসবে। নাটকটিকে ওই উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বলে উল্লেখ করেছেন বিভাস চক্রবর্তী।

'মায়া' একটি লোকনাট্যের আশ্রয়ে নির্মিত। মুর্শিদাবাদের একটি বিশিষ্ট অথচ লুপ্তপ্রায় লোকনাট্যের নাম আলকাপ। বহরমপুরে রেপার্টরি থিয়েটার জেলার স াংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং লালন - পালন করবার যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তারই ফলপরিণতিএই নাটক। আলকাপের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অভিজ্ঞতাঋদ্ধ না হলে এ জাতীয় পরীক্ষা - নিরীক্ষা সম্ভব নয়। সেই কারণেই বহরমপুরে বসে মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ এলাকায় অনুসন্ধান করে রেপার্টরি যে কাজ করতে পেরেছে, কলকাতার ঘেরাটোপে বন্দি নাট্যনির্মাতাদেরপক্ষে তা প্রায় অসম্ভব।

লোকনাট্য আলকাপের দলে শিল্পী ও বাজনদার মিলিয়ে বারো - চোদ্দ জন লোক থাকে। দল পরিচালককে বলে কবিয়াল ও ওস্তাদ। আলকাপ হচ্ছে কৌতুকধর্মী লোকনাট্য, যা শিল্পীরা তখন তখন মঞ্চে তৈরি করে নেন। তাৎক্ষণিক ব্যঙ্গনাট্য শুধু সংলাপে নয়, পরিবেশিত হয় ছড়ায়, নাচেগানে। দলে কবিয়াল একজন, একজন ভাঁড়, কিন্তু ছোকরা একাধিক। রেপার্টরির প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়ছিল, কীভাবে একজন আট-দশ বছরের বালককে শারীরিক ও মানসিকভাবে নারীরূপে গড়ে তোলা হয় অভিনয়ের জন্য। বালকটিকে চুল রাখতে হয়, হাতে চুড়ি, কানে দুল পরতে হয়, যাতে সে একটু একটু করে মেয়েলি হয়ে ওঠে। এরপর চলে গান ও ন াচের শিক্ষা। 'মায়া' নাটকে যে মাটির গন্ধ আছে, শুধুমাত্র তার জন্যেই বাংলা থিয়েটারে আঞ্চলিকতা প্রশ্রয় পাওয়া উচিত।

রেপার্টরি বহরমপুর শহরকে থিয়েটার নগরী গড়ে তুলতে চান। তাঁরা ডাক দেন, আপনার দুটো সন্তানের মধ্যে অন্তত একটাকে থিয়েটার শেখান। বিশেষ ত াৎপর্যপূর্ণ স্লোগান। লক্ষ্য অবশ্যই বহরমপুর ও সেই শহরের পিতামাতারা। তাহলে নিজেদের উদ্যোগে কলকাতায় নাটক ফেরি করতে আসেন কেন তারা? পরপর দু বছর ১৯৯১ ও ১৯৯২ রেপার্টরি নাট্যোৎসব কেন করতে হয় কলকাতার রবীন্দ্রসদনে? সেই আস্তিনে লুকানো চুম্বক টানছে। এই টানের কাছে পরাভূত হলে প্রদীপ ভট্টাচার্য কলকাতার নাট্যকর্মীদের ঝাঁকে মিশে হারিয়ে যাবেন। সিংহের লেজ হওয়ার চেয়ে ঘোড়ার মাথা হওয়াও ভাল।

এবার আরও একটি অঞ্চলের কথা। কলকাতার কাছে নয়, অনেক দূর -- যেমন আর এক বঙ্গে। বস্তুত সেইভাবেই আমরা উল্লেখ করি উত্তরবঙ্গ। বালুরঘাট

শহরে নাটকের ঐতিহ্য অনেকদিনের। নাট্যগৃহও ছিল। এই শহরের দুটো ছোট শৃঙ্খলাপরায়ণ নাট্যসংস্থা ত্রিশূল ও তৃতীর্থ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করল আলাদা আলাদা না থেকে একটি সংগত নাট্যদল গড়ে তুলতে পারলে একটা কাজের কাজ হয়। তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের কিছু সদস্য।

এই হল পশ্চাদপট। তৈরি হয়ে গেল ত্রিতীর্থ। কলকাতা থেকে দূরে বলেই এদের কল্যাণ হয়েছে। ত্রিতীর্থ কলকাতাকে নকল না করে নিজস্ব ঘরানা তৈরি করতে উৎসাহী হয়েছে। জন্মলগ্নের মাত্র একমাস পরে (১৯৬৯) স্থানীয় নাট্যমন্দিরে 'পুতুলখেলা' নাটক প্রযোজনা করে ত্রিতীর্থ জেলায় স্তিমিত নাট্যপ্রবাহকে বেগবতী করে তুলল। প্রথমাবধি পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তিনি আবিষ্কার করলেন পূর্ব অভিজ্ঞতা– টভিজ্ঞতা এমন কিছু জরি বিষয় নয়। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থ াকলে আনকোরা শিল্পীকে দিয়েও অভিপ্রেত কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। গৃহবধূ রমা তালুকদার তার প্রমাণ। সংস্থার সদস্যদের পরিবার থেকে মহিলা শিল্পীরা এসেছেন, সুতরাং এ বাবদে সাধারণত গ্রুপ থিয়েটার যে সমস্যায় পড়ে ত্রিতীর্থ তেমন সমস্যার মুখোমুখি হয়নি। ত্রিতীর্থের সময়নিষ্ঠা, দলগত অভিনয়নৈপুণ্য,শৃঙ্খলা, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। জার্মান নাটকের একাধিক বাংলা প্রযোজনার কৃতিত্ব আছে ত্রিতীর্থের। কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন ব্রেখটের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর 'গ্যালিলিও' নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য অনুরোধ করেছিল ত্রিতীর্থকে। ত্রিতীর্থ দ্রুত নাটকের প্রস্তুতি শেষ করে মাত্র তিন সপ্তাহ পরে বালুরঘাটে তাদের নিজস্ব মঞ্চে সেটি প্রথম অভিনয় করে (২৭.০৯.১৯৭৮)। ওই মাসে কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের ব্যবস্থাপনায় নাটকটি মঞ্চস্থ করার কর্মসূচি নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সে সময় নাটকটি কলকাতায় মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। গ্রুপ থিয়েটার হিস াবে ব্রেখটের 'গ্যালিলিও', বাংলায় প্রথম মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব তাই ত্রিতীর্থ দাবি করতে পারে। জার্মান নাটকের ছায়া অবলম্বনে ত্রিতীর্থের আর একটি নাটক 'ভাঙ াপট'। নীহার ভট্টাচার্য তার যে বাংলা কাঠামো তৈরি করেন তাতে বাহে ভাষা প্রয়োগ করে নাটকের নতুন মাত্রা যুক্তকরাহয়। কলকাতায় নাটকটি দেখে সাংবাদিকদের কেউ কেউ বলেছেন, 'কলকাতার জমিদারী ভাঙছে, 'বাংলার নাট্যচর্চার আর এক রাজধানী বালুরঘাট। এইসব মন্তব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে কলকাতার দাদাগিরি। উৎকর্ষ মাপা হচ্ছে কলকাতার মাপকাঠিতে। এর জন্যে যেমন দায়ী আমাদের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, তেমনি দায়ী আঞ্চলিক দলগুলির হীনমন্যতাও। সংস্থার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে (১৯৬৯-১৯৯৪) প্রেরিত বার্তায় মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, 'ত্রিতীর্থের প্রথম পর্ব' থেকে আজকে চলমান পর্ব নিয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ বই লেখার সময় এসেছে ...। ইতিহাস বিধৃত থাক।

এবার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলব, যে মানুষটি পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার বাইরে বাংলা নাটক নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৭৮ - এ তিনি ঘাটশিলায় তাঁর নিজস্ব নাট্যদল গঠন করেন – মাদল। প্রথম দিকে 'রক্তকরবী', 'সিংহাসন', 'রাইফেল', 'সাজানো বাগান', 'কালাবদর', 'দ্বীপের রাজা' প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করেছেন। তখন পর্যন্ত তিনি কলকাতার নাট্য ঐতিহ্যের অনুসারী। অজিত দেখেছিলেন তাঁর নাটকের দর্শকরা সিংভূম অঞ্চলের দরিদ্র, নিরক্ষর, অনগ্রসর ম ানুষজন। গ্রামে গ্রামে নাটক করতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন প্রচলিত বাংলা নাটকের ভাষা ও ভঙ্গি তাঁর দর্শকদের পক্ষে একটা বড় বাধা। সুতরাং খোলনলচে বদলাতে হল তাঁর। সিংভূমের লোকআঙ্গিকে, সিংভূমের প্রচলিত উপভাষায় নতুন করে নাটক গড়লেন তিনি। অভিনয় করলেন মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পের সূত্র নিয়ে রচিত 'আজির', 'বিছন', 'ডাইন', 'ভুতুয়া', রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি অবলম্বনে 'বলি' ইত্যাদি। সহজেই দর্শকদের কাছে পৌঁছতে পারছিলেন তিনি। বেশ চলছিল, নাটক দিয়ে মানুষের অনেক কুসংস্কার, অনেক ভীতাকে আঘাত করেছিলেন তিনি। এক সময় দেখলেন (১৯৯৩) তলে তলে শু হয়ে গেছে ভিডিয়োর মহিম া। থিয়েটারে আর লোক হয় না, সবাই গিয়ে জোটে যেখানে ভিডিও-তে রঙিন স্বপ্ন ফেরি করা হচ্ছে। অজিত অন্য পথ ধরলেন। নিজের নাটক ভিডিও কাসেটে বন্দি করে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতলব আঁটলেন। তৈরি করলেন একটা সংগঠন – ক্যাসেট বদ্ধনাট্যকর্মের সংগঠন, নাম থার্ড ভিসন। নাটকাকারে ভিডিও ছবি হল 'শিকার', 'ধীবর', 'বিছন'। যেখানে লঘু প্রমোদচিত্র দেখার জন্য লোক জোটে, সেখানেই পৌঁছে যায় থার্ড ভিসন টেলিভিশন আর ভিসিপি নিয়ে । এসো বিনা পয়সায় ছবি দেখো, তোমাদের নিজেদের কথা তোমাদের নিজেদের ভাষায়। মতলববাজ প্রমোদ ব্যবসায়ীদের বিদ্ধে এ জেহাদ ঘোষণা করতে বুকের পাটা লাগে। অজিত দেখেছেন সিংভূমের উপভাষায় রঘুপতির সংলাপ শুনতে শুনতে গ্রামের অনগ্রসর মানুষ আবিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুসারে নাটককে গড়েপিটে নিতে হবে, সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বোধের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে, শিল্পগুণের কোনও খর্বতা না ঘটিয়ে। পরীক্ষামূলকভাবে কাজটা করে যাচ্ছেন তিনি।

এমনি আরও অঞ্চল আছে –– পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও। যেমন দিল্লী, মুম্বই, ত্রিপুরা, আগরতলা, অসমের শিলচর, উত্তরপ্রদেশের কানপুর, লখনউ, এলাহাবাদ। এসব জায়গায় কে কী করছেন, কোন দল কী ভাবছেন, সেসব খবর কিছুই বড় একটাআমাদের কাছে এসে পৌঁছয় না। গুণগত বৈষম্য থাকতেই পারে, তবু তো তাঁরা সেই কাজই করেছেন যা বহু আলোচিত নাট্য সংস্থাগুলি করছে কলকাতায়। নাট্য আন্দোলনের তারাও শরিক। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি বহির্বঙ্গ ন াট্যোৎসব করে। স্থান ঃ কানপুর, লখনউ, মুম্বই। অভিনয় করে কলকাতার বা কদাচিৎ কলকাতার বাইরের শহরতলির বাছাই করা নাট্যদল। শিলচর, আগরতলা, মুম্বই, দিল্লীর বাংলা নাটক তাতে আমন্ত্রণ পায় না কেন? দেশের ভূখণ্ডের বিভাজন আছে, সীমাসরহদ আছে, বিচ্ছেদও আছে। বিচ্ছেদ আছে মহানগরী ও মফস্ বলেও। কিন্তু বাংলা নাটক তো সকলেরই অভিন্ন সংস্কৃতির অঙ্গ।

বাংলা নাটকের প্রতি সংবাদ মাধ্যমের শীতল অনাগ্রহ সত্ত্বেও, কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছি, সংঘনাট্যের কোনও কোনও প্রযোজনা বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক উত্তরসম্পাদকীয় নিবন্ধ আকারে প্রশস্তিমূলক প্রচার পাচ্ছে। কোনওটা তাপস সেনের জবানিতে, কোনওটা মৃণাল সেনের। আবার যেদিন সন্ধ্যায় নাটকের প্রথম অভিনয় সেদিনকার পত্রিকায়, হিসেব মতো পর্দায় ওঠার বারো ঘন্টা আগে, বেল তার প্রচারমূলক প্রিভিউ, এমন দৃষ্টান্তও আছে। বিশাল মফস্বল বাংলার পাঠকদের হাতে রাখতে কলকাতাশ্রয়ী সংবাদপত্রে বড় শরিক সপ্তাহে জেলাভিত্তিক সাপ্লিমেন্ট প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্ট জেলার নাট্যসংবাদের কণিকাও থাকে না। সংব াদপত্র কাকে কোল দেবে এবং কেন দেবে এ বাবদে তাদের নিজস্ব কিছু অঙ্ক আছে। কিন্তু এ ধরনের লোক জড়ো করা ঢাঁড়া পিটুনির মতো লেখাশুধু যে পূর্বসংস্কার বর্জিত দশকের মুক্তচিন্তাকে প্রভাবিত করে তাই নয়, সেই সঙ্গে একটা ভুল সংকেতও পাঠায়। সেটা হল এই যে নাটকের ব্যাপারে কলকাতাই পশ্চিমবঙ্গ, যার সীমা উত্তরে গিরিশ মঞ্চ ও দক্ষিণে মধুসূদন। এবং বাংলা থিয়েটারে সাংঘাতিক যা কিছু হচ্ছে কলকাতাতেই হচ্ছে। যাঁরা সেসব হওয়াচ্ছেন বলে কাগজওয়ালারা তা রিফ করছে, আমি জানি না তাঁদের মধ্যে এমন একজনও আছেন কি না যিনি একা একটা গোটা নাটককে পূর্ণ প্রাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন, যেমন পারতেন উৎপল দত্ত ('মানুষের অধিকারে') কি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ('মঞ্জরী আমের মঞ্জরী')। আজকের থিয়েটারে কোথায় সেই চেহারা, কোথায় সেই গলা!

বাংলা পেশাদার থিয়েটার তো মরেহেজে গেছে, সমান্তরাল সংঘনাট্যও পূর্বগৌরব হারাচ্ছে। স্টার থিয়েটার পুড়ে গিয়েছিল, , কুড়ি কোটি টাকা খরচ করে তার পুনর্নির্মাণ হয়েছে। মিনার্ভা থিয়েটার রাজ্য সরকার কিনেছে, সংস্কার হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওইসব নাট্যগৃহে নাটক করবে কারা? বাংলা থিয়েটারের নবীন প্রজন্ম ক ালেভদ্রে এক - আধটা নাটক করে হইচই ফেলে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আগের মতো সপ্তাহে তিনদিন চারটে কি পাঁচটা শো করে দর্শক টানার মতো উপাদান তাতে নেই।

হঠাৎ টিভি এসে গেল দেশে। অসংখ্য চ্যানেল। অজস্র ধারাবাহিক। থিয়েটারের নবীনেরা সেখানে হিরো - হিরোইন। এদের চেয়ে অনেক উঁচু মাপের মধ্যবয়সি ন াট্যশিল্পীদের একটা অংশ আমাদের সৌভাগ্যবশত স্বস্থানে অবস্থান করে থিয়েটারকে আঁকড়ে রইলেন। বাকিরা শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকলেন। অনেকের নিজস্ব

নাট্যদল ছিল, কোনওটা উঠেই গেল। কোনওটা হিতোপদেশের শিয়ালের মতো পুরোনো জনপ্রিয় প্রযোজনার একই কুমিরছানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগল। থিয়েটার করে পেট চলে না, তবু জীবিকার জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কাজ করবেন না, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মঞ্চনাটককে দুয়োরানি করে তাঁরা অনেকেই তাঁদের একদা অর্জিত থিয়েটারি গৌরব হারিয়েছেন। আর হারিয়েছেন গ্রুপ থিয়েটারের অলিখিত আচরণবিধি মেনে চলার নীতি। এই অবক্ষয়নিয়ে লেখালেখি চোখে পড়ে না। এত যে সেমিনার, এত যে স্মারক বক্তৃতা তাতেও প্রসঙ্গটা ওঠে না। রেখেঢেকে দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টাকরি। বাংলা থিয়েটারের দুই শক্তিমান অভিনেতা টিভির পর্দায় অতি নিম্নমানের কৌতুক - নকশার যুগলবন্দি করে নকল হিরোমুত্তোর কদর পাচ্ছেন। থিয়েটারের মরশুমে 'হিরেমুত্তো'-র কল - শো করছেন। একজন এখনও অবরে সবরে নিজ দলের নাটক করেন। আর একজনের দল উঠে গেছে। যিনি পার্টটাইম নাটক চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি অন্য দলেও খেপে খাটেন। তাঁর সাবেক ভাবমূর্তি আর নেই। দর্শকের সম্ভ্রম থেকে তিনি চ্যুত হয়েছেন।

কলকাতার যেসব গ্রুপ থিয়েটার নিয়মিত বা অনিয়মিত শো করতে পারে, শো - এর দিন তার আগের দিন, তিন বা পাঁচ সি.এম পরিমাণ হলেও দৈনিক সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারে, তাদের বেশির ভাগ শিল্পী বা নেপথ্যকর্মী আসে মগরা বা চন্দননগর, রহড়া বা নৈহাটি, কোতরং বা আন্দুল, সরশুনা বা সোনারপুর — এমনি সব কলকাতার কাছে পিঠের মফস্বল শহর থেকে। শুধু থিয়েটার করতেই আসে এমন নয়, এদের অনেকেই চাকরি বা কলেজ - ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো সূত্রে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে।পকেটে একখানা মান্থলি থাকে সুতরাং রাহাখরচ কোনও সমস্যাই নয়। সারাদিন খাটাখাটনির পর, পেটে খিদে নিয়ে, কলকাতার যানবাহনের প্রবাদখ্যাত ভিড় ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ওরা সময়মতো আকাদেমি বা মুক্তাঙ্গনে পৌঁছয় এবং শো-এর শেষে ক্লান্ত দেহটাকেই টানতে টানতে উজান - যাত্রার সমান ঝকমারি সহ্য করে হাওড়া বা শিয়ালদায় গিয়ে দশটা বাহান্নর লোকাল ধরে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশ যায়।

এই নিষ্ঠা সবটাই বিশুদ্ধ নাট্য - প্রেমের জন্য বা এরা সবাই সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনের সংগ্রামী কর্মী, এমন নাও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এরা, সবাই না হলেও কেউ কেউ, দলপতির স্তোক ও প্রবঞ্চনার শিকার। অবশ্য মোহমুক্ত হতে দেরি হয় না, যখন তারা বোঝে সংগ্রামের নামে ব্যবসা করে এক বা দুজনের সংসার চলে, ব াদবাকি উপোসী সহযোগিতায়, তখন দল ভাঙে, দল বদল হয়। অনেকে আশা কুহকিনী বুঝেও লেগে থাকে, পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং থিয়েটার থেকে টিভি সিরিয়ালে চান্স পাওয়ার অস্পষ্ট সম্ভাবনায় তা দেয়। সাহিত্যের মতো থিয়েটারেও বহু শক্তিশালী স্বল্প অভিনেতার দিন শেষ হয়ে গেছে, এসেছে স্বল্প শক্তিশালী বহু অভিনেতার যুগ। বেশির ভাগই পার্শ্বচরিত্র, ক্রাউড সিনের অন্তর্ভুক্ত, মঞ্চে ওরা সংখ্যা, নাম নেই। পুরোপুরি পার্শ্বচরিত্র হয়তো ওরা কোনদিনই হবে না। তবু যায় অ াসে।

এরা ক্ষমতাহীন একথা বলা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয়। কলকাতার মোহ, নামী পরিচালকদের সান্নিধ্য পাবার লোভ ওদের এমনভাবে গ্রাস করেছে যে যেখানে ওদের প্রতিভা সহজে বিকাশ লাভ করলেও করতে পারত, সেই মফস্বল থিয়েটারের প্রতি ওদের প্রবলঅনাগ্রহ। যে ছেলেটি, উদাহরণ হিসেবে বলছি, পাড়ার পরিচ ালক একটু বকলেই মুখভার করে, কলকাতার 'দাদা'র হাতে নিগ্রহ তার কাছে পুরস্কার। নিজের শহরে, বাড়ির পাশে, রিহার্সালে যেতে যার অবধারিত বিলম্ব, কলকাতায় শত অসুবিধা সত্ত্বেও সে পাংচুয়াল। কলকাতার বাইরে অনেক অভিজ্ঞ পরিচালককে এ রকম আক্ষেপ করতে শুনেছি।

এইসব পরিচালকেরা কলকাতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটি নাট্য আন্দোলনের ধারাকে মফস্বলে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই শীতের মরশুমে, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়া রি পর্যন্ত মফস্বল শহরে শহরে যে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য যাঁদের ঘটেছে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন উক্ত পরিচালকদের যথেষ্ট যে াগ্যতা ও কুশলতা আছে। অথচ কলকাতায় খুব সাধারণ মানের একটিনতুন প্রযোজনা নিয়ে যত লেখালেখি হয়, মফস্বলের এই তিন - চার মাসব্যাপী নাট্য প্রতিযো গিতা নিয়ে তার এক শতাংশও হয় না।আর তা হয় না বলেই ছেলেরা উড়তে শিখলেই কলকাতায় ছোটে, ওরা কলকাতায় চলে যায় বলেই মফস্বলের দলগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষবৃত্ত অনেককাল ধরে চলছে।

আগাগোড়া কলকাতার কাছাকাছি শহরতলি অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা, যারা বড় দলের স্বেচ্ছাসেবী হয়ে আখেরে টিভি ধারাবাহিকের পেশাদার আর্টিস্ট হবার স্বপ্ন দেখে, তাদের বোঝাতে হবে অভিনয়শিল্পী হয়ে ওঠার পদ্ধতি ও অনুশীলন, পেশাদারিত্বের শর্ত ইত্যাদি। নাটকের কথা দিয়ে শু করেছি, সুতরাং বিষয়টা নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। উকিলবাবু কালো কোট চড়িয়ে কোর্টে বেলেই পেশাদার। ডাক্তারবাবু চেম্বারে গী দেখলেই পেশাদার। দুজনেই ফি দাবি করবেন। একজন অভিনেতার পক্ষে এমনটা অসম্ভব, এমনকী তিনি দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা থেকে পাশ করে এলেও। এলেবেলে শিল্পীকে কেউ পয়সা দেয় না। আগে তাঁকে তঁ ার যোগ্যতাপ্রমাণ করতে হয়। তিনি যেতে পারেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের শৌখিন থিয়েটারে তার প্রমাণ দিয়ে পেশাদার মঞ্চে উঠে এসেছিলেনশিশিরকুমার ভ াদুড়ি। এই সাফল্য বা উত্তরণের কতকগুলি শর্ত আছে। প্রথম প্রশ্ন, যিনি নাট্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেতে চান, তিনি নাট্যকর্মটিকে মনেপ্রাণে ভালোবাসেন কি না। যদি বাসেন তবেই তিনি কর্মটিকে পূর্ণ সময়ের পেশা করে তুলতে পারবেন। আমি ভুলিনি যে, খালি পেটে শিল্প - সংস্কৃতি হয় না। জীবিকার জন্য তিনি অন্য কিছু নিশ্চয়ই করবেন। বাকি সময়টাকে আমি নাট্যচর্চার পূর্ণ সময় বলছি।অন্যতর অর্থকরী পেশায় যুক্ত থাকার সময়ও নাট্যচিন্তাই করবেন, জমিদারি সেরেস্তায় খাতা লিখতে লিখতে রামপ্রসাদের গান লেখারমতন, এমনটা হলে আরও ভালো। প্রতিদিন নিয়মিত নির্বাচিত সংলাপাংশ পাঠ করে তাতে নতুন নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবেন। গলা চড়ায় ওঠোনো, খাদে নামানো প্র্যাকটিস করবেন। গাইয়েরা যেমন রেওয়াজ করেন।

এককথায়, ধাপে ধাপে উৎকর্ষের সাধনা পেশাদারের প্রাত্যহিক কৃত্য। এর ফলে একধরনের ডিসিপ্লিন তৈরি হয়। সময় ও কর্মনিষ্ঠার বিনিময়ে সেরাটুকু নাটক ও থিয়েটারকে দিতে পারেন অবলীলায়। পেশাদারিত্ব মানে পয়সা দিয়ে দেখার মতো excellence। যিনি তাঁর অভিনয়ে সেই আশ্চর্য উৎকর্ষকে প্রকাশ করতে প ারেন সদর্থে তিনিই পেশাদার। আমাদের এই অঞ্চলে, কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলতে, এই পেশাদারিত্বের সুযোগ কতখানি, এ - প্রশ্ন অনেকেই আমাকে ভা বিয়েছে। আবৃত্তি শিল্পের ক্ষেত্রে কেউ কেউ এই লক্ষ্যে এগুচ্ছেন, আবৃত্তি জিনিসটা ব্যক্তিগত চর্চার বিষয় বলেই হয়তো। নাটক দলগত শিল্প, তাই একা একা অভিনয় - চর্চা কঠিন হয়। এতদঞ্চলে এখনও হাতেগোনা কয়েকটি নাট্যদল আছে, যারা দক্ষ, সমর্থ। পরিকাঠামোগত সুযোগ - সুবিধা নেই, তাই তারা যে একাঙ্ক - নাট্য - প্রতিযোগিতা - মঞ্চ - আশ্রয়ী হয়ে রইল। মুক্তক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারল না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের প্রিয় নাট্যদলগুলি সারা বছরের তিনভাগ জলে যায়। একভাগ সলিড। প্রতিযোগিতা ধাওয় া করে সারা পশ্চিমবঙ্গ, আর ফাঁকে ফাঁকে নাগপুর, লখনউ, ইলাহাবাদ, বিলাসপুর চষে বেড়ালে মরশুমের শেষে অবসাদ স্বাভাবিক। গোটা কতক প্রাইজ পেলে ত ার উত্তেজনা থিতুতেও সময় লাগে। পরের বছরের নাটক স্থির করেতার প্রস্তুতিতে দলপতির যে তৎপরতা, অভিনয়শিল্পীদের অনুশীলন, সবই মরশুমি হয়ে পড়ে। নিয়মিত হল না, ফলে, অপ্রতুল অনুশীলনে কারও পক্ষে কি প্রথম বা দ্বিতীয় অর্থে পেশাদার হয়ে ওঠে আদৌ সম্ভব? এর একমাত্র সমাধান কলকাতা - নিরপেক্ষ অঞ্চলিক থিয়েটার। যেমন হয়েছে আমাদের শহরের অনতিদূরের কল্যাণীতে। হয়েছে বহরমপুরে, শিলিগুড়িতে, কালিয়াগঞ্জে এবং বালুরঘাটে। গোবরডাঙ্গার দুটি দল তো গোটা পশ্চিমবঙ্গকে চমকে দিয়েছে।

উপসংহারে শুধু একটা কথাই বলা যায় যে, দর্শক - সাধারণের মনের সঙ্গে নাট্যকর্মীদের সৃজনকর্মের কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না, এবং তা হচ্ছে না বলেই দুই তরফেই একধরনের উদাসিনতা তৈরি হচ্ছে। তা সে কলকাতায় হোক, মফস্বলে হোক কি বাদবাংলা নাট্যক্ষেত্রেই হোক। যেহেতু এ শিল্পের কাঁচামাল তাজা জ্যান্ত নরনারী, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, এ সংকট সাময়িক, কেটে যেতে দেরি হবে না।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com